Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: ফিরে দেখা উনিশ শতক

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Abu Dayen
Published online	August 21, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.1
Pages	1-21
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.1
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১-২২

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*: ফিরে দেখা উনিশ শতক

আবু দায়েন
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: abu.dayen@juniv.edu

সারসংক্ষেপ

সৃজনশীল প্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বসভ্যতার এক বিস্ময়। তিনি যাঁর সন্তান, সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও বাংলার ইতিহাসে বিশিষ্ট জন। কিন্তু পুত্র রবীন্দ্রনাথের কীর্তির আড়ালে অনেকখানি চাপা পড়ে আছে পিতার ব্যক্তিত্ব। উনিশ শতকে বাংলার প্রগতি ঘটেছে যেসব কীর্তিমান মানুষের কারণে, তাঁদের একজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পারিবারিক জমিদারি তাঁর পেশা হলেও তিনি মূলত ধর্মতাত্ত্বিক—ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি সমাজসেবক-সংস্কারক, তত্ত্বব্যাখ্যাতা, ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা। তাঁর রচিত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *আত্মজীবনী* মূলত ব্রাহ্মধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনায় ভরপুর। তা সত্ত্বেও নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে উনিশ শতকের বাংলার বিবিধ ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর রচিত বইটিতে। বর্তমান রচনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* অবলম্বনে উনিশ শতকের বাংলার অন্বেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, কলকাতা, উনিশ শতক, বাংলার প্রগতি, ব্রাহ্মধর্ম, সমাজসংস্কার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) পরিচয় বহুবিধ। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পিতা, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অনুক্রমিক কর্তা, উনিশ শতকের কলকাতা-কেন্দ্রিক টালমাটাল বাংলার প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী। আবার তিনি উনিশ শতকের বিশিষ্ট ধর্মসাধক, ধর্মসংস্কারক, ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক-প্রচারক, ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা। এ রকম বহুবিধ তকমার মধ্যে কোনটা তাঁর মূল পরিচয়, ভাবার অবকাশ আছে। আজকের বাংলায় কিংবা বিশ্বপরিসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই অধিকতর পরিচিত। সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঔরসজাত ১৫ সন্তানের মধ্যে চতুর্দশ। পঞ্চদশ সন্তান বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৮৬৪) শিশুকালে মারা যাওয়ার দরুন রবীন্দ্রনাথই সর্বকনিষ্ঠ। এই কনিষ্ঠ সন্তানের পিতৃত্ব দেবেন্দ্রনাথের বড় পরিচয় হয়ে উঠেছে! কে না জানে, কোনো পিতাই সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত হতে অধমর্ণবোধ করেন না; বরং সন্তান-গরবে তাঁর বুক স্ফীত হয়ে ওঠে। আজকের দিনে দেবেন্দ্রনাথকে খুঁজতে গেলে 'রবীন্দ্রনাথের পিতা' পরিচয়ই সবার আগে সামনে আসে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলার সাহিত্যের আকাশে সত্যিকারের রবি। সন্তানের প্রতিষ্ঠার কাছে পিতার কৃতিসমূহ ঢাকা পড়ে গেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উনিশ শতকের উত্তাল সৃষ্টির দিনের বহু জ্ঞানী-গুণী স্বনামে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁদের অনেকের তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ কম কিছু করেননি যে, সন্তানের পরিচয়ে তাঁকে চিনতে হবে। কিন্তু এটা তাঁর পিতৃসত্তার অনুপম সার্থকতা, নিজের যাবতীয় কৃতি ছাপিয়ে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা হিসেবে আমাদের সাম্প্রতিক মানসে বরণীয় হয়ে উঠলেন।

রচনার শুরুতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পরিচয়গুলো দেওয়া হয়েছে, তার সবই সত্য। আরো সত্য যে, তাঁকে আবিষ্কার করার আরো কিছু নির্ণায়ক বাকিই থেকে গেছে। বাংলার প্রগতির আদিপর্বে কলকাতা শহরের সমান তালে বেড়ে ওঠা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অনুক্রমিক কর্তৃত্বে মধ্যবর্তী বা অন্তমধ্যবর্তী কর্তা দেবেন্দ্রনাথ। যদিও রবীন্দ্রনাথ *ছেলেবেলা* বইয়ে তাঁর শৈশবকে চিহ্নিত করেছিলেন এভাবে: 'সাবেক কালের বড়োমানুষীর ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল' (রবীন্দ্রনাথ ২০১৮: ১০)। বলা যায়, দেবেন্দ্রনাথ-পর্ব ঠাকুর পরিবারের অন্তিম দশা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বহু রকম ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বিচার করা যেতে পারে। তবে বর্তমান অনুসন্ধান তাঁর রচিত বই *আত্মজীবনী* অবলম্বনে। বইটি আগে লেখা হলেও তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। তবে ঠিক কবে থেকে তিনি লেখা শুরু করেন আর কবে শেষ করেন, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ১৮১৬ শকে (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) লেখা একটি দানপত্র বইয়ের শুরুতে সংযুক্ত করেছেন দেবেন্দ্রনাথ। এতে তিনি *আত্মজীবনী*র যাবতীয় স্বত্ব প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দান করেন। এ থেকে সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। তিনি লেখেন:

> ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমার জীবন-কাহিনী উনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম। ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না। তোমার প্রতি এই আমার আদেশ, ইহা সর্বতোভাবে পালন করিবে। (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার-দানপত্র)

একই দানপত্রে তিনি এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের অধিকার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদান করেন। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের অধিকার প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকেই দেন। উক্ত বইয়ে ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথকে যেমন পাওয়া যায়, *আত্মজীবনী*র সূত্র ধরে পাওয়া যায় উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির নানা পরিচয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানা তথ্য এই যে, সংসার আর বিষয়কর্মে বিরাগী এই মনীষী মানবজীবন ধারণ করে মানবোত্তর সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন আজীবন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতার বিপরীতে পাল তুলে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন, তারই গুণ টেনে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও রামমোহন রায় ব্রাহ্ম নামে পৃথক ধর্মপ্রতিষ্ঠার চেয়ে হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনেই অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। রামমোহনের বিলাত গমন এবং আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সংস্কারকর্মে ভাটা পড়ে, যার ঝান্ডা আজীবন বহন করে নিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজীবন ব্রহ্মসাধনার সংসারত্যাগী, বিষয়বিরাগী মনোভাবের কারণে জীবদ্দশায় তিনি লাভ করেছিলেন 'মহর্ষি' পরিচয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কর্তা, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠায় মুখ্য দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিত্ব এবং সমাজসেবার বহু কীর্তির কারণে তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা বাঙালির জীবনে বিশেষ কিছু। সেই বিশেষত্বের স্বরূপ সন্ধান বর্তমান রচনার উদ্দিষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*র সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন রচনা করেছেন তাঁরই কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

> আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে এই যে বই লিখেছেন সেটা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল। (২০১৮: ১৭৭)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যের আদিপর্বের লেখক। উনিশ শতকের তিরিশের দশকে তিনি কয়েক বছর সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন। তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় উন্নত গদ্যচর্চার নজির ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা পাঠ্যবই রচনার ঠেকায় পড়ে নানা কিছু লিখেছেন। সেসবের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এসে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে তিনি যখন অনেক কিছু লিখছেন, তখনও বিশিষ্ট লেখকদের অনেকের আবির্ভাব ঘটেনি। পূর্বে যেমনটা উল্লেখ করেছি, *আত্মজীবনী* বইটি এর প্রকাশকালের (১৮৯৮) বহু আগে লেখা হলেও তখনকার উন্নত গদ্যের লেখকদের রচনাও আজকের চোখে ভারবাহী। তখন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমযুগ এসে গেছে। তাঁরা বড়ো লেখক। সে তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের লেখক-পরিচিতি গৌণ। কিন্তু আজকের চোখে দেবেন্দ্রনাথের *আত্মজীবনী*র গদ্য ঋজু, ভারমুক্ত ও প্রাঞ্জল। অবশ্য এ কথা জোর দিয়ে বলারও সুযোগ নেই, দানপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের গণ্ডিতেই (নিজের ১৮ থেকে ৪১ বছর বয়সে) তিনি *আত্মজীবনী* লিখেছেন। সমালোচক-ঐতিহাসিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন:

> তাহার রচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাঁচায় আবদ্ধ প্রবন্ধ-পাখি যেন ব্যক্তিমনের খোলা জানালা দিয়া মুক্তিলাভ করিয়া অসীম নভোবিহারের পথে উধাও হইয়াছে। তাহার *আত্মজীবনী*তে

> (১৮৯৮) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের, মন্ময় আন্তরিকতার একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার এই সুরটি পরবর্তী যুগে তাহার পুত্র রবীন্দ্রনাথে আরো প্রসারিত ও আরো বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া প্রবন্ধের নূতন রূপবিধান করিয়াছে। (১৯৯৩: ১২৩)

দেবেন্দ্রনাথের লেখকসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীকুমার অনুভব করেন, তাঁর রচনার 'বিষয়-বৈচিত্র্য ততটা ছিল না'; ছিল 'ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তা'। 'অনুপম গদ্যের মোড়কে' নিজের উন্নত জীবনের যে ছবি দেবেন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তা নিয়ে আলোচনা কমই হয়েছে। তিনি আরো লেখেন:

> তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ *ব্রাহ্মধর্ম* (১৮৫০), *ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান* (১৮৬০), *পরলোক ও মুক্তি* (১৮৯৫) ও *আত্মজীবনী* (১৮৯৮) বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে কিঞ্চিৎকর নয়। সাহিত্য মনে রাখে সাহিত্যকর্মকে। দেবেন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা ধর্মতত্ত্ব আলোচনা। জীবন, প্রকৃতি, ইতিহাস, পুরাণের পরতে পরতে ঈশ্বরের সার্বভৌম অস্তিত্বের অনংশীদার প্রকাশ। তিনি কবিতা ও গানও লিখেছেন। তবে ধর্মীয় সঙ্গীত। ব্রাহ্মসঙ্গীত। ফলে সাহিত্যামোদী মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালির মহৎ জীবনের নির্মাণে তিনি ও তাঁর পরিবারের যে অবদান তার অনুসন্ধানে উন্মোচিত হয় লেখক দেবেন্দ্রনাথের বোধিসত্তার অনুপম ঔজ্জ্বল্য। (১৯৯৩: ১২৩)

চির চঞ্চল গতিতে ঈশ্বরাভিমুখে অনংশ হয়ে ওঠার ব্যাকুলতার পাশাপাশি ভারতভূমির অন্তরাত্মার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাঁর পর্যটনে:

> তাঁর ঈশ্বরাভিসারী মন আজীবন যে মহাসত্তার মিলনে চঞ্চল গতিতে বিচরণশীল ছিল তাঁর রচনা তারই প্রকাশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও *আত্মজীবনী* গ্রন্থে বাঙালির ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পরিবারের ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প আছে। সমকালীন ইতিহাসের বিবরণ আছে। একজন ভ্রমণপিপাসু পর্যটকের চোখে ব্রিটিশ ভারতের বিস্তীর্ণ জনপদের তন্বিষ্ঠ উপস্থাপনা আছে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চোখে বাংলার 'রেনেসাঁস' বলে বহুল কথিত উনিশ শতকের সময়চিত্রের বুনন আছে। ইতিহাস ও অন্যান্য গবেষণা থেকে উনিশ শতক সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি, দেবেন্দ্রনাথের নিজের চোখে বিবরণী সেই তুলনায় অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক, গ্রহণীয়, আদরণীয়। (১৯৯৩: ১২৩)

৮৭ বছরের দীর্ঘ জীবন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। টালমাটাল, সৃষ্টিচঞ্চল উনিশ শতকের মূল ঘটনাবলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, গড়পড়তা সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর দেখা ভিন্নধর্মী ও ব্যঞ্জনাবহ। সেই দেখার নানা প্রান্ত উঠে এসেছে সমাজ-সংস্কৃতি-প্রথা-পদ্ধতি-শাসন-সংগ্রামসহ বিবিধ বিষয়ে। *আত্মজীবনী* বই মূলত নিগূঢ় তত্ত্বচর্চা ও ধর্মদর্শনের নিরিখে লেখকের আত্ম-অভিজ্ঞান-সুচিহ্নিত। সেই সত্যের নিপাট বুনন সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি বইটিতে ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষদর্শীর নির্মোহ বয়ানে।

*আত্মজীবনী*র ভাষ্য অনুযায়ী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মা অলকাসুন্দরীর মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের মুকুরে বাস্তবতার আলো ফেলা প্রথম ঘটনা। উক্ত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আত্মজীবনীকার রহস্যময় মানবজীবন ও বাস্তবের ঘেরাটোপে এক আধিভৌতিক অভিঘাতে অভিষিক্ত হন।

অলকাসুন্দরী দেবেন্দ্রনাথের দিদিমা। তবে তিনি দ্বারকানাথের গর্ভধারিণী নন। নীলমণি ঠাকুরের পুত্রদের মধ্যে বড় রামলোচন ও মধ্যম রামমণি। রামলোচনের এক কন্যা সন্তান হয়ে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। পরে আর সন্তান হয়নি। অলকাসুন্দরী এই রামলোচনের স্ত্রী। রামমণির স্ত্রী মেনকা দেবীর গর্ভে রাধানাথ ও দ্বারকানাথ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। যদিও দুর্গামণি নামে দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে রমানাথ নামে রামমণির আরেক পুত্রসন্তান ছিলেন। ১৭৯৯ সালে নিঃসন্তান বড়ভাই রামলোচন ছোটভাই রামমণির ৪ বছর বয়স্ক পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। ফলে দ্বারকানাথ রামলোচন ও অলকাসুন্দরীর পুত্রপরিচয়ে বেড়ে ওঠেন। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে রামলোচনের মৃত্যু হলে দ্বারকানাথ রামলোচনের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি মা অলকাসুন্দরীর প্রতি ভক্তিমান ও তাঁর একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও নিজের বুদ্ধি বলে দ্বারকানাথ অতি অল্প সময়ে বিপুল বিত্ত অর্জন করেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের কাছে বন্ধুবাৎসল্য ও আতিথেয়তার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল তাঁর। কিন্তু মা জীবিত থাকতে তিনি কখনো বিদেশিদের সঙ্গে খাবার খাননি। তাঁর বিদেশিয়ানা ও বিলেতগমন অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পরের ঘটনা। উনিশ শতকের তৎকালীন হিন্দুসমাজ নানা পশ্চাৎপদ ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। রোগ-শোকের ঊর্ধ্বে মানুষের জীবন নেই। কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা হবে। শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত তাকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সর্বোচ্চ আন্তরিক সেবা দেবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ধর্মীয় বিধান হিসেবে তৎকালের বাংলায় চালু ছিল অন্তর্জলি প্রথা। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে গঙ্গাতীরে জল-স্থলের সন্ধিভাগে রেখে মন্ত্র-শ্লোকপাঠের মাধ্যমে বিবিধ আচার পালন করা হতো। অপেক্ষা করা হতো যতক্ষণ না রোগীর মৃত্যু হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, নদীতীরের খোলা হাওয়ায় একজন রুগ্নমানুষ প্রবল আর্দ্রতায় অধিকতর রুগ্ন হয়ে ওঠার কথা। এই অমানবিক প্রথা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অগ্রসর পরিবারেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদিমা অত্যন্ত ধার্মিক ও সুশীলা নারী অলকাসুন্দরীকে পর্যন্ত এর শিকার হতে হয়। *আত্মজীবনী*র শুরুতেই উনিশ শতকের এই অমানবিক প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়:

> ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, 'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।' অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরো বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলৈন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি বলিলেন, তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমায় গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব; আমি শীঘ্র মরিব না। (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: ৩০)

কথামতো দীর্ঘদিন গঙ্গার খোলা জল-হাওয়ার পরশে বেঁচে রইলেন তিনি। অন্তর্জলী যাত্রা করার পর তাঁকে তো আর ঘরে তোলা যায় না! ঘাটে ফেলে রেখে ফেরাও যায় না। পালা করে পরিবারের সদস্যদের নদীতীরে দায়িত্বপালন করতে হয়। দিদিমার অনুরক্ত যুবক দেবেন্দ্রনাথ দিনরাত নদীতীরে বসে থাকেন। খোলা হাওয়া, গঙ্গাজলের স্নিগ্ধ ঢেউ, আকাশজুড়ে মেঘের মিতালি আর দূর অনন্তলোকে নক্ষত্রের মিটিমিটি খেলা যেন দেবেন্দ্রনাথকে ইশারা করে ডাকে। সৃষ্টির অপার লীলা আর গ্রহ-নক্ষত্রের বিলাস নিসর্গ, মানবজীবন ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের চেতনায় ঢেউ তোলে। লেখকের বর্ণনায়:

> দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল—'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ... মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। (২০০৮: ৩০)

দ্বারকানাথ ঠাকুর পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজস্ব বিষয়বুদ্ধিগুণে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিলেন। পরিবারের সে সময়কার বিষয়-সম্পত্তির সামান্য বর্ণনা দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর:

> আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথমবার যান। তখন তাঁহার হুগলী পাবনা রাজশাহী কটক মেদিনীপুর রঙ্গপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী, এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। (২০০৮: ৭৯)

কিন্তু সম্পদ তাঁকে টানেনি। বরং সমস্ত বর্জন করে তিনি মুক্ত হতে চেয়েছেন। হতে চেয়েছেন 'কল্পতরু':

> দিদিমার মৃত্যুর পর এক দিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, 'আজ আমি কল্পতরু হইলাম; আমার নিকট আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব।' আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু বলিলেন যে, 'আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দিন, ঐ ছবিগুলান দিন, ঐ জরির পোশাক দিন।' আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সকলই দিলাম। তিনি পর দিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: ৩৪)

দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য নিয়ে পিতা দ্বারকানাথের ভয় ছিল। ভয়ের কারণ বিষয়সম্পত্তিতে তাঁর অনীহা। সাংসারিক কাজে তিনি নির্মোহ, অনাসক্ত। শুরু থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে বিষয়ী করে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানে এতটাই মশগুল ছিলেন যে, জীবনব্যাপী—কি পিতার জীবদ্দশায়, কি তাঁর উত্তরকালে তিনি বিষয়ে মনোযোগী হতে পারেননি। তৎকালের বিশিষ্ট উপনিষদজ্ঞ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি নিয়মিত তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ করতেন। বিরাট বিরাট জমিদারি এস্টেট, বিপুল বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী, সংসারের বড় ছেলে বিষয়ে বিরাগী হলে পরিবারে সংকট হওয়ারই কথা। সে সংকট আঁচ করে দ্বারকানাথ ছেলের সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে সংশ্রবের কথা জেনে বিরক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আমাদের বাড়িতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না; যে যেহেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়-বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না। (২০০৮: ৫৩)

পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর সামাজিক খ্যাতি, পাশ্চাত্য রুচির অভ্যস্ততা ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সাহেব-মেমদের সঙ্গে মিশেছেন। পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সে সাক্ষ্য *আত্মজীবনী*তে দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। ভক্তিবিনত উদার ভাষায় সেসবের প্রতি তাঁর বিরাগের কথাও ব্যক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর প্রতি পিতা দ্বারকানাথের বিরক্তির কারণ। গভর্নর জেনারেল লর্ড অরল্যান্ডের পরিবারসহ সাহেবদের নিয়ে ঠাকুরদের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে এক জমকালো পার্টি দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। সেখানে গভর্নরের বোন ইডেনসহ তখনকার নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশদের সপরিবারে আপ্যায়ন করা হয়। সে অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি লেখেন:

> রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরাজদের মহা ভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীরা বলিয়াছিলেন যে, 'ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙ্গালীদের ডাকেন না।' এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি এক দিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া বাইনাচ ও গানবাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস করিলেন। সে দিন তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও পরিতোষণ করা আমার একটি নিতান্ত কর্ম ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন পড়িয়া গিয়াছিল; আমি সেই সভা লইয়া ব্যস্ত ও উৎসাহী—আমরা সেই দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। অতএব, এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আর বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না; পিতার শাসনে ও ভয়ে আমি একবার তাড়াতাড়ি করিয়া সেই বিলাসভূমি ঘুরিয়া চলিয়া আসিলাম। এই ঘটনাতে আমার মনে ঔদাস্য তাঁহার নিকটে বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন যে, আমি বেদান্ত পড়িয়া, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া, না খারাপ হই। তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মান মর্য্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ন হইয়াছিলেন। (২০০৮: ৫৩)

অবস্থাপন্ন পরিবারের তরুণরা যৌবনে বিলাসব্যসন-আমোদপ্রমোদে সময় ব্যয় করে, অপচয় করে। নানা দিকে নানা সংকটের সৃষ্টি করে পরিবারকে বিব্রত করে। বিষয়-কর্ম আর সংসারে মন থাকে না। দেবেন্দ্রনাথও বিরাগী-বিবাগী। কিন্তু কী অদ্ভুত উপলক্ষ্যে! যে বয়সে তরুণদের ধর্মকর্ম বিষয়ে সামান্য মনোযোগী করা যায় না, তেমন সময় দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচিন্তায় মশগুল হয়ে সংসার-সাম্রাজ্য উচ্ছন্নে নেবার বন্দোবস্ত করলেন। তখন চারদিকে তাঁর সমালোচনা; তিনি ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে সব শেষ করছেন। তেমনি বিবরণ:

> আমার পিতা তখন ইংল্যন্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সকলই আমার উপর পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত; আমি কেবল বেদবেদান্ত, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ও চরম-গতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়িতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম কাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না; জলে স্থলে তাহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাহার পালনী শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম না। (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: ৬৯)

ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব ব্যাংক পরিচালনার কথা দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি থেকে জানা যায়। উনিশ শতকের সেই প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতায় ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। নাম ইউনিয়ন ব্যাংক। ব্যাংকিং ব্যবস্থার তখন কী-ই বা হাল। সেই সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠে বেসরকারি ব্যাংক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃনির্দেশে পরিবারের সেই ব্যাংকে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই কর্মের সামান্য স্মৃতিচারণ পাওয়া যায় তাঁর *আত্মজীবনী*তে:

> ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ন ব্যাংকে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধনরক্ষক; আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে, যতক্ষণ না কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমায় থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। (২০০৮: ৪১)

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মাত্র ৫১ বছর বয়সে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বারকানাথ তখনকার ব্রিটিশ ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। তাঁর গুরুত্ব বোঝা যায় তাঁর প্রতি ব্রিটিশ রাজের আচরণে। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার ইংল্যান্ডে গেলে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে গ্রহণ করতে জাহাজঘাটে এসেছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর সম্মানে বাকিংহাম প্রাসাদে আয়োজন করেছিলেন নৈশভোজের। লন্ডন থেকে প্যারিসে গেলে তৎকালীন ফরাসি সম্রাট লুই তাঁকে স্বাগত জানাতে আসেন। সেই দ্বারকানাথের অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো দেশ কেঁপে উঠেছিল। পিতার মৃত্যু ও পরবর্তী নানা বিষয় দেবেন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন *আত্মজীবনী*তে। তাঁর জবানিতে:

> ১৭৬৮ শকে শ্রাবণ মাসে লন্ডন নগরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ৫১ বৎসর বয়ঃক্রম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এবং আমার পিস্তুত ভাই নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আশ্বিন মাসে আমি সেই সংবাদ প্রাপ্ত হই। মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে তাঁহার কুশ-পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া আমার মধ্যম ভ্রাতার সহিত গঙ্গার পরপারে যাইয়া তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করি। (২০০৮: ৭৪)

পিতার মৃত্যুতে তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতি তাঁকে পালন করতে হয়েছে। পদে পদে পড়তে হয়েছে বিড়ম্বনায়:

> এই দিবস হইতে আমরা যথারীতি দশ দিবস হরিষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অশৌচকালে শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত প্রতি দিবস প্রাতে উঠিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত খালি পায় কলিকাতার তাবৎ মান্য লোকদিগের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতাম, এবং মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই সকল আগন্তুক ভদ্রলোকদিগকে আপনার বাটীতে অভ্যর্থনা করিতাম। পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপস্যা পালন করিতে হয়, তাহা আমি সমুদায় করিয়াছিলাম। (২০০৮: ৭৪)

কিন্তু ধর্ম ও সামাজিক বিধিবিধান তখনকার দিনে অত্যন্ত কড়া। ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার সমস্ত বিধি পদে পদে অগ্রাহ্য করে এসেছেন আরো আগে থেকে। পরিবার ও সমাজের চোখে তিনি বিদ্রোহী। সংশয়াকুল অবিশ্বস্ত পুত্র। ফলে দ্বন্দ্ব প্রতি পদে:

> আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, 'দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম ক'রে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম।' আমি তখন রাজা রাধাকান্ত দেবের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গেলেম, তিনি আমাকে কাছে বসাইয়া আমার পিতার অনেক সংবাদ

> জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন, 'শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিও।' তাহাকে আমি বিনয়ের সহিত বলিলাম, 'আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত লইয়াছি; সেই ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না। তাহা করিলে ধর্ম্মে পতিত হইব। আমি কিন্তু শ্রাদ্ধ যে করিব, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদের মতে করিব।' তিনি বলিলেন, 'সে হবে না, সে হবে না। তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্ব্বক হবে না। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনো; তাহা হইলে সব ভাল হইবে।' আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম, 'আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন তো আর শালগ্রাম আনিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিব না। যদি তাহাই করিব, তবে ব্রাহ্মই বা কেন হইলাম, প্রতিজ্ঞাই বা কেন করিলাম?' তিনি নতশিরে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'তাহা হইলে সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, সকলে আমাদিগের বিপক্ষ হইবে। সংসার তবে আর কি করিয়া চলিবে? মহা বিপদেই পড়িব।' আমি বলিলাম, তাই বলিয়া পৌত্তলিকতাতে যোগ দিতে পারা যায় না।' (২০০৮: ৭৪-৭৫)

এমতাবস্থায় ভীষণ নিঃসঙ্গ একাকী দেবেন্দ্রনাথ। পাশে কেউ নেই। চলতিপথের বাইরে কেউ যেতে চায় না। সামাজিকতা-সংস্কার রক্ষা করা চাই। সবাইকে নিয়ে চলা চাই। কিন্তু যে সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তা কোনোভাবেই আর গ্রহণ করবেন না, স্থিরচিত্ত দেবেন্দ্রনাথ:

> কাহারো নিকট হইতে আর আমি এ বিষয়ে উৎসাহ পাই না। আমার প্রিয় ভ্রাতাও আমার উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। সকলেই আমার মতের বিরোধী। এমনি বিরুদ্ধ ভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। সকলের মনে হইল, যেন আমার একটি কাজে সকল থাকে বা সকল যায়! আমি একা একদিকে, আর সকলেই আমার আর এক দিকে। কাহারো কাছে একটি আশ্বাসবাক্য পাই না, সাহসের কথা পাই না। (২০০৮: ৭৫)

এই নিঃসঙ্গতা, সামাজিক ভ্রুকুটি, ধর্মবাদীর নিন্দা-মান্দ্য উত্তরকালেও দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়েনি।

দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর কোম্পানি ছিল তখনকার দিনে বড় রকমের হুন্ডি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান। সওদাগরি ব্যবসা, মালিকানা ঠাকুর পরিবারের। তাতে ইংরেজসহ বেশকিছু কর্মচারী কাজ করত। বিদেশে দ্বারকানাথের আকস্মিক মৃত্যুর পর সহায়-সম্পত্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছিল না। পরিবারের অনাসক্ত বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন তিরিশ। পরিপূর্ণ তদারকির অভাবে বিভিন্ন ব্যবসায় ছুটে যাচ্ছে। দিকে দিকে পতন হচ্ছে। ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মে দেনাপাওনার ব্যাপার থাকে। পাওনা আদায় হচ্ছে না। দেনা বাড়ছে। কার-ঠাকুর কোম্পানির মতো প্রতিদিনকার নগদ অর্থের কারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই অবস্থার বর্ণনা করছেন দেবেন্দ্রনাথ:

> আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানী টলমল করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কত দিন চলে? এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল; সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানী হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল, অফিসের দরজা সকল

> বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য-ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। (২০০৮: ৯০)

বাংলা তথা ভারতবর্ষের উন্নয়ন আজও এক ধাঁধা। সড়ক-রেল বা আকাশপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ডে এ দেশ আজও কত পেছানো। উনিশ শতকের সেই বাংলার কথা অকল্পনীয়। যোগাযোগের অসুবিধার কারণে খুব কাছের জনপদও ছিল দূর-বিদেশ। বাড়ি ছেড়ে কর্মসূত্রে কারো কম-বেশি দূরে থাকা প্রবাস হিসেবেই চিহ্নিত হতো। বিদেশ বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝি, তখনকার দিনে তা অত বেশি সম্প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। *আত্মজীবনী*র শেষ দিকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় দেবেন্দ্রনাথের ঘুরে বেড়ানোকে তিনি নিজেই দূরপ্রবাস বা বিদেশ বলেছেন। কলকাতার একদম কাছেই, পাশের জেলা বর্ধমান। কলকাতার কেন্দ্রস্থল থেকে বর্ধমানের কেন্দ্র পর্যন্ত সড়কপথের বর্তমান দূরত্ব ১০২ কিলোমিটার। সেই বর্ধমানে যাবার সহজ কোনো উপায় ছিল না। যোগাযোগব্যবস্থা বলতে ছিল মূলত নৌকা ও গরু-ঘোড়ার গাড়ি। ব্রিটিশরাজের কল্যাণে আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। চালু হয় রেল, সড়ক ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নৌ-যোগাযোগব্যবস্থা। তাও অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গের রাজশাহী বা কুষ্টিয়ার যোগাযোগ না হয় না-ই ধরা হলো। দুর্গমতার এমন বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথের রচনায়। নৌভ্রমণে বের হয়ে সাত দিন ধরে দামোদর নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরে বর্ধমান শহরের কাছে হাজির হওয়া তেমন দুর্গমতারই পরিচয় দেয়:

> ১৭৭০ শকের আশ্বিন মাসে কততগুলি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া দামোদর নদীতে বেড়াইতে যাই। সাতদিন সেই দামোদরের বাঁক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় তাহার তীরের একটা চড়ায় নৌকা লাগাইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে, বর্ধমান ইহার খুব নিকটে, দুই ক্রোশ দূরে। অমনি আমার বর্ধমান দেখিতে কৌতূহল হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ চড়া ভাঙ্গিয়া বর্ধমান চলিলাম। রাজনারায়ণ বসু আর দুই-এক জন আমার সঙ্গে। সহরে পঁহুছিলাম। তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, জ্বলিতেছে। আমরা ইতস্তত বেড়াইয়া সহর দেখিলাম, বাজার দেখিলাম, রাজবাড়ি দেখিলাম। রাজবাড়ির মধ্যে বাতির আলোকে আলোকিত একটা ঘরে রাজা যেন বসিয়া আছেন, শার্শীর বাহির হইতে আমাদের তেমন মনে হইল। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া আবার দামোদরের সেই চড়াভূমি দিয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: ৯৭)

আশৈশব ভাবুক দেবেন্দ্রনাথ। প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। দিদিমা অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে *আত্মজীবনী*র সূত্রপাত, তাঁর ভাবুকতার শুরুও দেখা যায় ওখানেই। চিরায়ত ভারতীয় সমাজের দেবার্চনানির্ভর ধর্মজীবন তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। গঙ্গাতীরে দিদিমার অন্তর্জলিযাত্রার আয়োজনে মধ্যরাতে নদীর মৃদু মন্দ হাওয়ায় মানবজীবনের উদাস নিরাশ অনন্তযাত্রার মধ্য দিয়ে যে বৈরাগ্য তিনি লাভ করেন, আজীবন তা তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরেছে এক অনন্ত অদৃশ্য একক ঈশ্বরের সন্ধানে। ব্রহ্মজ্ঞানে উতলা হয়ে সাতাশি বছরের জীবন পুরোটাই তিনি ব্যয় করে গেছেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি, দিদিমার মৃত্যুর পর ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে তিনি নিজেকে কল্পতরু ঘোষণা করেন। সেই অল্প বয়সে নিজের সমস্ত কিছু দান করে বিষয়ভোগের আকর্ষণ থেকে হালকা হওয়ার চেষ্টা করেন। বয়স তখন মাত্র ১৮ বছর; তিনি মনের স্থিরতার সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। কাজ করেন ইউনিয়ন ব্যাংকে দিনরাত।

সকাল দশটা থেকে রাত দশটা। কাজে যাওয়ার আগে সকালবেলা আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে আসে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি ছিন্নপত্র। তিনি তখনো সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু ওতে কী লেখা আছে, তা জানার তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাঁর আশ্রিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে কাগজটা দিয়ে যান তার অর্থ লিখে রাখার জন্য। কিন্তু শ্যামাচরণ তার অর্থ করতে অপারগ হন। পরে ডাক পড়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের, যিনি সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পড়ে শোনালেন ঈশোপনিষদের চরণ:

> ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যঃ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। (২০০৮: ৪১)

দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন:

> যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং' ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই। উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।' ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই, তাহাই পাইলাম। (২০০৮: ৪১-৪২)

উনিশ শতকের সামাজিক অনগ্রসরতার মূল কারণ ছিল শিক্ষার সংকট। শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। অল্প কিছুকাল আগের টোলের শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষার কিছু আয়োজন কোথাও কোথাও ছিল। কিন্তু যে ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত ব্রিটিশের হাতে হয়, তা সর্বত্র বিস্তৃত ছিল না। শহর কলকাতায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তখন হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের শৈশবে তেমন শিক্ষার আয়োজন ছিল। নিজের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরো ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত' (২০০৮: ৪০)। আর ছিল মিশনারি স্কুল। পাদ্রিরা জায়গায় জায়গায় বিনাবেতনে স্কুল খুলেছিল। সেসব স্কুলে পড়তে আসা মূলত হিন্দু শিক্ষার্থীদের কৌশলে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা ছিল। এমনভাবে বহু বাঙালি হিন্দুকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই ইউরোপীয় মিশনারিরা নানা রকম আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে বিশেষত নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। এর প্রমাণ আঠার শতকে পর্তুগিজ পাদ্রি মানোয়াল দ্য আসসুম্পসাঁওয়ের তৎপরতা। উনিশ শতকে রাজকাজে ইংরেজ সাহেবদের অধিকারসূত্রে ব্রিটিশ মিশনারিদের সেই তৎপরতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। ফলে হিন্দুসমাজে দেখা দেয় আতঙ্ক। উক্ত আতঙ্ক দূর করতে তৎপর হয়েছিলেন তরুণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমন এক ঘটনার প্রতিবিধানে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তেমন বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর *আত্মজীবনী*তে:

> ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, 'গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুই

> জনে একখানা গাড়িতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়িতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলাম যে, 'আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না।' কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। (২০০৮: ৬৬)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখান:

> যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরে রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রীদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমাদিগের, দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। (২০০৮: ৬৬)

এ ঘটনার বেশ দ্রুত সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উৎসাহিত করেন নিজস্ব অর্থায়নে দেশীয় ভাবধারার স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সংগঠিত করেন। ১৭৬৭ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব উভয়ে দশ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে সম্মত হন। আরো অনেকের চাঁদায় ওই সভায় একদিনে চল্লিশ হাজার টাকার তহবিল তৈরি হয়, যার দ্বারা 'হিন্দুহিতার্থী' বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি এবং হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন তার সম্পাদক। প্রথম অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত হন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।' (২০০৮: ৬৭)

ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশে রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে সমাজের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। সেই স্তিমিত কার্যক্রম চাঙা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন মন্দীভূত কার্যক্রম সত্ত্বেও রামমোহনের বাড়িতে ব্রাহ্মসভার উপাসনা হতো। সেই উপাসনা দেখতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাতে জড়িয়ে পড়েন। আগে থেকেই বেদান্ত দর্শনে তাঁর অনাস্থা, উপনিষদে আগ্রহ এবং নিরাকার সর্বত্র সঞ্চারী একেশ্বরে ধ্যান তাঁকে আকুল করে রেখেছিল। সেই আকুলতার সূত্রেই নিজের বাড়ির পুকুরপাড়ে এক ঘরে আত্মীয়-পরিজন ও সমমনাদের নিয়ে তত্ত্বালোচনা করতেন। যার মুখ্য আলোচক ছিলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি একদিন নিজেই তত্ত্বব্যাখ্যা করেন। সে থেকে তত্ত্বালোচনা সভার নাম তিনি

প্রথমে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' রাখেন, যা পরে বদলে গিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হয়। দেবেন্দ্রনাথই এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ। স্মৃতিচারণে তিনি লিখছেন:

> আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিত্রভাবে স্তব্ধ ভাবে গ্রহণ করিলেন। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান।
>
> ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে আমি প্রস্তাব করিলাম যে এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী' হউক, এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য-পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই 'তত্ত্ববোধিনী' সভা সংস্থাপিত হইল। (২০০৮: ৪৩)

'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার চার বছর পর ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তত্ত্বালোচনার বিষয়বস্তু অনুপস্থিত সদস্য ও সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন দেবেন্দ্রনাথ। নিজ অর্থব্যয়ে দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং সম্পাদক হিসেবে খ্যাতিমান লেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করেন। এই পত্রিকা উনিশ শতকের বাংলার যুক্তি-বুদ্ধিচর্চার আন্দোলনে সর্বসাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আকর হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সেই পর্বের স্মৃতি পাওয়া যায় *আত্মজীবনী*তে:

> এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।
>
> এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই জানিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এই রূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। (২০০৮: ৪৫)

উক্ত সংকল্প থেকে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* প্রকাশ শুরু। এর আর্থিক ও সাংগঠনিক দায় তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিকে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর মতো স্বাধীনচেতা, বিজ্ঞানমনস্ক কর্মবীরকে নিজের মর্জি অনুযায়ী কাজে লাগানো। সে কঠিনকে তিনি সম্ভবপর করেছেন:

> সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার রচনাতে গুণ ও দোষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রহী ও মধুর; আর দোষ

> এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ-সন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলত তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ;—আকাশ পাতাল প্রভেদ! (২০০৮: ৫১)

দেবেন্দ্রনাথের অর্থসংগতি ও সাংগঠনিক কর্মের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মেধা যুক্ত হয়ে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* বাংলার চিন্তাজগতে আলোকসঞ্চারী হয়ে ওঠে:

> তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল। (২০০৮: ৫১)

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আশৈশব অনুরক্ত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়তে তাঁর বাগানবাড়িতে যেতেন তিনি। স্কুল শেষে বাগানে ছোটাছুটি করতেন। গাছ থেকে ফলফলাদি ছিঁড়ে খেতেন। রামমোহন রায় তা প্রশ্রয় দিতেন। নিজে লিচু পেড়ে খেতে দিতেন। শৈশবে বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করতে যান রামমোহনকে। রামমোহন পূজা-অর্চনায় অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তাঁর আচরণ দেবেন্দ্রনাথের মনে গভীর পরিবর্তনের রেখাচিত্র এঁকে দেয়:

> আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোনো কার্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ি বাড়ি যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া কহিলাম, 'নীলমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।' শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'বেরাদর! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।'
>
> এত দিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রামমোহন রায় যেমন কোনো প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম। (২০০৮: ৪০)

এমনি মানসিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায় দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন:

> ১৭৬৪ শকে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পূর্ব্বে ইংলন্ডের ব্রিস্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। আমি মনে

> করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরো অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই। আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষদ পাঠ করিতেছেন; সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন; শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। (২০০৮: ৪৬)

দেবেন্দ্রনাথ জাতপাতের ব্যবধান নিবারণ করেন। দায়িত্বগ্রহণ করেন ব্রাহ্মসমাজের। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ব্রাহ্মসভা একীভূত করেন:

> ... ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম, এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলাম। নির্দ্ধারিত হইল, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে। সেই অবধি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভা উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য্য হইল, এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনী সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের যোড়াসাঁকোস্থ কমল বসুর বাড়ি ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়; এবং এই ভাদ্র মাসে তাহার যে সাম্বৎসরিক সমাজ হইত, তাহা আমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই ১৭৫৫ শকে উঠিয়া গিয়াছিল। (২০০৮: ৪৭)

মানুষে-মানুষে বিভেদ দূরীকরণ, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চৈতন্য ও ঈশ্বরের একত্বের যে বাণী নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়েছিল, তাতেও এক পর্যায়ে জাতপাতের ভেদ লক্ষ করেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তা নিবারণ করেছিলেন। লেখকের জবানিতে:

> ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা—যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আবার একদিন দেখি যে, সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম। (২০০৮: ৫৪)

রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা'কে ধর্মে রূপ দেন দেবেন্দ্রনাথ। মুখ্যত তিনিই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধর্মকর্ম পালনার্থে ব্রাহ্মরা নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ অবলম্বন করতে পারছিল না। তাদের লিখিত কোনো শাস্ত্র বা আচার-নির্দেশিকা ছিল না। বেদ-উপনিষদের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক অংশ তারা অনুসন্ধান করে ধর্মকর্ম করতেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞানের যে সূচনা করে গেছেন তারই উত্তরকাণ্ড ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহনের লালিত আদর্শ অনুসরণ করেই ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ। তবে বিকাশের যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হলো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেধা-শ্রম-সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও আর্থিক আনুকূল্যে। তিনিই পৌত্তলিকতার সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য ভেঙে সমাজ-সংসার-আত্মীয়-পরিজন ও হিন্দু সনাতনী ধার্মিকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ব্রাহ্মধর্মকে বাঙালির জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। *আত্মজীবনী*র

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন যে, একটা পর্যায়ে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ঐক্যস্থলের শূন্যতা অনুভব করেন। তন্ত্র-পুরাণ-বেদান্ত-উপনিষদ কোথাও তিনি সবাইকে ঐক্যে বাঁধার ভিত্তিভূমি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি অনুভব করলেন:

> ব্রাহ্মধর্মের এমন একেটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম; বলিলাম, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।' তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম। অমনি একটি পেনসিল দিয়া সমুখের কাগজ-খণ্ডে তাহা লিখিলাম, এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম, ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক; তখন আমার বয়স ৩১ বৎসর। (২০০৮: ১০৬)

এই বীজ বাক্সের মধ্যে রেখে তিনি ভাবতে থাকলেন ব্রাহ্মদের জন্য একটি ধর্মগ্রন্থ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন থেকে নিজস্ব ধ্যান ও দীর্ঘকালের উপনিষদ অধ্যয়নের সার রূপে তিনি নিজেই রচনা করলেন ধর্মগ্রন্থ:

> তখনি আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, 'তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো, এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক।' এখন আমি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য-সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম, এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ... এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বরপ্রসাদে, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া গেল। কিন্তু ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ত করিতে আমার সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না। (২০০৮: ১০৬)

দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্ধিত এই ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে সামান্য কোনো ব্যাপার নয়। যদিও একে খাটো করার প্রবণতাও লক্ষণীয়: 'ব্রাহ্মধর্ম জনমনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথিতে ভোজ উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে খুব ভিড় হলেও, বুধবার সমাজে লোক খুব কমই আসত' (স্বপন ১৯৮৫: ৭৯)। কালিপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশা*তেও ব্রাহ্মধর্ম ও তার অনুসারীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। লেখক স্বপন বসু ব্রাহ্মধর্ম ও দেবেন্দ্রনাথকে মূল্যায়ন করেন এভাবে:

> 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কার্যক্রমের প্রতি ক্রমশ শিক্ষিত জনগণের কৌতূহল দেখা দিলে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি যথার্থ আগ্রহীদের বাছার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। দীক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রও প্রস্তুত হয়। ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ, দেবেন্দ্রনাথ আরো ২০ জন অন্তরঙ্গের সঙ্গে ব্রাহ্মণধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ পরিণত হল ব্রাহ্মধর্মে। রামমোহনের আদর্শ থেকে দেবেন্দ্রনাথ বেশ কিছুটা সরে এসেছিলেন। 'ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদ'কেই দেবেন্দ্রপন্থীরা বেদান্ত বলে গ্রহণ করতেন, বেদান্তদর্শনকে শ্রদ্ধা করতেন না। পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে তারা অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী হয়ে উঠলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে, রামমোহনের 'উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি' পরিণত হল 'সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টি'তে। (১৯৮৫: ৭৭)

নিষ্ঠ হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মদের বিরোধ আগাগোড়াই ছিল। নিঃশেষিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের আজকের যুগেও সেই বিরোধ তিরোহিত হয়নি। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পৃথিবীর কোথাও কোনোকালে দুর্লভ নয়। সে কালের তমসাচ্ছন্ন সময় এই বিরোধ বাঙালির জীবনে বিপরীতে হিত হয়েছিল। দ্বন্দ্বকে পুঁজি করেই মানুষের চেতনা জেগে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের সুফল যেমনটা প্রত্যক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের আখ্যানে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভেতর ছিল সংস্কার ভাঙার প্রবল মানসিক জোর। জীবনকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নির্মোহভাবে দেখার শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন ছেলেবেলাতেই। তারই অংশ হিসেবে তিনি বর্জন করেছিলেন পূজা-অর্চনা, পৌত্তলিক জীবনবোধ ও ধর্ম, অদৃশ্য অযৌক্তিক সংস্কার ছেড়ে যুক্তিবাদকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন। যে সার্বভৌম ঈশ্বর তথা ব্রহ্মের সাধনায় একজীবন তিনি অতিবাহিত করে গেছেন, তা যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর *আত্মজীবনী* ধর্মীয় তত্ত্বালোচনা হলেও এতে গোঁড়ামির উপস্থিতি নেই। অন্ধবিশ্বাসে তাঁর অনাস্থার প্রমাণ পুরো বইয়ে বারবার উঠে এসেছে। উঠে এসেছে কাশিভ্রমণে গিয়ে দেবদেবীর মূর্তিপূজায় অনাস্থা প্রকাশে, কামরূপ ভ্রমণে গিয়ে কামাখ্যার মন্দিরে পূজা দিতে অনাস্থা প্রকাশ ও পূজারিদের পয়সা দিতে অস্বীকার করায়, এসেছে দিল্লি-উপকূলে যমুনাতীরের পূজারিদের সঙ্গে সরল বিশ্বাসে অর্থদান প্রশ্নে নিজের অনমনীয় অবস্থানে। এমন কঠিন মানসিক অবস্থান তাঁকে নিতে দেখা গেছে পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে, সিমলার রাজপুরোহিতের নিমন্ত্রণে, ব্রহ্মদেশে এবং আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে। শুধু দেবদেবীর প্রতি অনাস্থাই নয়, জীবনযাপনের নানা প্রসঙ্গেও তাঁর এমন অনমনীয় মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় *আত্মজীবনী*তে। বন্ধনমুক্তির এই দীক্ষা কোথা থেকে তিনি পেলেন, এটাও একটা প্রশ্ন। এটা শুধুই রামমোহনের প্রভাব কি না, কিংবা সেখানে পারিবারিক প্রভাব কিছু আছে কি না। পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে ইতিহাসের বিরূপ পাঠ লক্ষ করা যাক:

> ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের প্রভাবে একেশ্বরবাদীতে পরিণত হলেও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন নি, প্রতিমা পূজা বা জপে তাঁর একটুও ভক্তি কমে নি। সাহেবসুবোদের সঙ্গে খানাপিনা করলেও আবার শেষে গঙ্গাজল স্পর্শ ও বস্ত্রত্যাগ করে শুদ্ধ হতেন। তারপর যেদিন থেকে মেমসাহেবদের প্ররোচনায় তাঁদের সঙ্গে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হতেন, সেদিন থেকে দেবপূজা ত্যাগ করে ১৮ জন পুরোহিত নিযুক্ত করে তাদের দ্বারা সব কাজকর্ম করাতে লাগলেন। এ সময় হতে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না। পূজাপার্বণে ঠাকুরদালানে উঠতেন না, সাধারণ দর্শকের মতো উঠানে দাঁড়িয়ে দেবদেবী দর্শন করে প্রণাম করতেন। তাঁর ভ্রষ্টাচারের জন্য বাড়িতে তিনি একঘরে হন। কিন্তু তাঁর হিন্দু আচার-আচরণ ও বারমাসে তের পার্বণ অব্যাহত ছিল। (স্বপন ১৯৮৫: ৭২)

মননশীল চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না, উপরের বর্ণনা যতটা চরিত্রচিত্রণ, ততোধিক চরিত্রহনন। আজকের দিনে ঠাকুরবাড়ির প্রতি ভারতবাসী বা বাঙালির, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে উচ্ছ্বাস তা ঐতিহাসিক ধারাক্রমের রূপান্তর। ঠাকুর পরিবারের বিরোধিতা বা নিন্দা-মান্দ্যের ঘটনা খুব বিরল নয়। সনাতনী হিন্দুধর্মের সংস্কারে হাত দেওয়ার কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদেরকে ধর্মনিষ্ঠ সমাজ সহজ ভক্তিবিনতভাবে গ্রহণ

করবে, সেটা দুরাশা। তা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মুগ্ধপাঠ বিস্তর; এবং এটাই প্রবল শক্তিশালী পথ তাঁকে চেনার:

> দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে এরূপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখা যায় নাই। ডিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেরে ন্যায় সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানেও তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার সদাশয়তার অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। (শিবনাথ ১৯৮৩: ১২০)

ঠাকুর পরিবার যে প্রগতিশীল জীবনচর্চা করে গেছে, তা কেবল নিকট অতীতের ব্যাপার নয়। বরং এটা পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ। সেই ঐতিহ্যের এক স্তম্ভ দ্বারকানাথ ঠাকুর। ব্যক্তিচরিত্রে সমাজচিহ্নিত দোষ-গুণের বাইরে তাঁর অনুকরণীয় বিষয়গুলো পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না, এমনটা হতে পারে না। ধার্মিক দেবেন্দ্রনাথ পিতার কথিত 'ভোগবিলাসী' চরিত্রের বাইরে সংস্কারের আগল ভাঙার দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারত কতটা ভক্তিবিনতভাবে গ্রহণ করেছে, তার স্বরূপ নির্ণয় নিতান্ত দুসাধ্য নয়। তাঁর নিজের জবানিতেই, এমনকি নিজের পরিবারে একঘরে হয়ে থাকার কথা জানা যায়।

পূর্বে উত্থাপিত স্বপন বসুর বইয়ে দ্বারকানাথের যে চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে, তাঁর মতিগতি, মেমসাহেবদের নিয়ে 'ভ্রষ্টাচার', একেশ্বরবাদে প্রকাশ্য আস্থার আড়ালে অনেকটা লুকিয়ে দেবার্চনা, গঙ্গাজলে শুদ্ধ হবার চেষ্টা—এ সব ঐতিহাসিক সত্য, না উনিশ শতকের ধর্মীয় বিরোধে প্রতিপক্ষ উত্তরপুরুষদের কলঙ্কলেপন—তার মীমাংসা অধিকতর ঐতিহাসিক অন্বেষণ-সাপেক্ষ ব্যাপার। আসলে, একটা প্রবল প্রতাপশালী ধর্মীয় সমাজের মূল স্রোতের বাইরে যাওয়া কঠিন কাজ। সেই কঠিনের পথে হেঁটে দেশ-কাল-পাত্রভেদে কত মানুষ কত রকমের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছেন, তার কোনো হিসাব নেই। হিন্দুর সন্তান রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন। বিনিময়ে জীবদ্দশায় ও মরণোত্তরকালে তাঁর ভাগ্যে কী পরিমাণ গঞ্জনা জুটেছে, তা ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ তৎকালীন কলকাতায় কোনো হেলাফেলা করার মতো লোক ছিলেন না। কিন্তু হিন্দু আদর্শের বিপরীতে দাঁড়ানো বলে কথা! যেখানে এক বিরাট ভৌগোলিক জনপদ ও তার বিপুল মানুষ সেই আদর্শের পতাকাতলে সামিল। নিজ জীবনে কতটা প্রতিকুল স্রোতে তিনি ভেসেছেন, সে পরিচয় তাঁর *আত্মজীবনী*তেই মেলে। আদর্শবাদী উত্তরপ্রজন্ম তাঁর মূল্যায়ন সেই আদর্শেরই নিরিখেই করেছে।

একেশ্বর ব্রহ্মের প্রতি তাঁর নিবিড় বিশ্বাস জন্মায় বেশ কম বয়সেই। তখন তিনি স্কুলে পড়েন। সেই বয়সে পৌত্তলিকতায় প্রবল অনাস্থা পেয়ে বসে তাঁকে: 'যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল, আমার চেতন হইল। আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম' (দেবেন্দ্রনাথ ২০০৮: ৪০)। পরিণত বয়সে এসে সেই মানসিক সমর্পণ কর্মসম্পাদনে সম্পন্ন হয়। বহুকাল ধরেই ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে পূজা-অর্চনা হতো। পূজার আড়ম্বর, জনসমাগম ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা, আতিথেয়তা করা ছিল পারিবারিক রীতি। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন:

> দশ বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, এখনো আমাদের বাড়িতে পূজা হয়—দূর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে, আমাদের ভদ্রাসনের বাড়ি হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্ত্তব্য। আমার ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগের সম্মতি লইয়া, ধীরে ধীরে পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। (২০০৮: ১১৫)

কিন্তু কাজটা ছিল দুঃসাধ্য। সেই অসাধ্যকে তিনি সাধন করেন:

> আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদার মন ও প্রশস্ত ভাব দেখিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। তিনি বলিলেন যে, 'দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না; করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে। তথাপি আমার উপদেশ ও অনুরোধে বাধিত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজাটা উঠাইয়া দিতে আমার ভ্রাতারা সম্মত হইলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের বাড়ি হইতে চিরদিনের জন্য রহিত হইল। দূর্গা পূজা চলিতেই লাগিল। (২০০৮: ১১৫)

সিমলার পর্বতবাসী মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায়। নানা জাতি-গোষ্ঠী-জাতপাতের দেশ ভারত। প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতপাতের বিধান চলে এসেছে। জাতপাতের এই বিধান তৈরি করেছে অসম অর্থনৈতিক শ্রেণি, যার শিকার হয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারী। ভারতের সিমলায় তাঁর দুই বছর অবস্থানকালে সেখানকার যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন, তার বিবরণ দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ:

> এই পর্ব্বতবাসী ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা, পরে ঠাকুর, সর্ব্বশেষে জমিদার। এখানকার জমিদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমিদারদিগেরও এই দশা। পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা। রাজা ও রাণাদিগের বিবাহকালে সখীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণা হয়। সখীর গর্ভেও পুত্র রাজপরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সখীর গর্ভে জাত কন্যা রাজকন্যার সখীরূপে পরিচিতা থাকে, এবং সেই রাজকন্যারই স্বামীর হস্তে তাহাদিগের জীবন ও যৌবন সমর্পণ করিতে হয়। কি অনর্থ! কি অনর্থ! রাজার ও রাণার রাণীও অনেক, সুতরাং সখিও বিস্তর। এক স্বামীর মৃত্যু হইলে ইহারা সকলে বন্দীর ন্যায় কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া যাবজ্জীবন রোদন করিতে থাকে। ইহাদিগের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। (২০০৮: ১৬৪-৬৫)

সিমলার কাছাকাছি এক পার্বত্য গ্রামে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের ভিন্ন চিত্র: 'তাহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পাণ্ডবদের মত তাহারা সকল ভাই মিলে একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে।' (২০০৮: ১৫১)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*র বড় অংশ জুড়ে আছে সংসারবিরাগী হয়ে তাঁর ঘরছাড়া জীবনের আখ্যান। ৩৯ পরিচ্ছেদে রচিত *আত্মজীবনী*র শেষ এক চতুর্থাংশ জুড়ে আছে

সংসারযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর বিবরণ। এই বিবরণ ভ্রমণকাহিনির অসাধারণ সৌন্দর্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে নৌকাযোগে বেরিয়ে পড়েন। নবদ্বীপ, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, অমৃতসর হয়ে একই সফরে তিনি পৌঁছে যান হিমাচলের সিমলা পর্যন্ত। এক বছরের অধিককাল বিস্তৃত এই সফরে তিনি ব্রহ্মধ্যানের পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের জীবন ও ভূগোলকে দেখেছেন নিবিষ্টভাবে। তিনি নৌপথে দিল্লি অতিক্রম করার সময়ে দেখতে পান ব্রিটিশ ভারতে নামমাত্র মোগলসম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর যমুনার চরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন মনের আনন্দে। এক বছর পর ফিরে আসার সময় তিনি দেখতে পান সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর মোগলসম্রাট হন ইংরেজেরই আনুকূল্যে। ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী মহাসংগ্রামে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্রাটের যোগসাজশের অভিযোগ ওঠে। ইংরেজ সরকার দিল্লির সালতানাত বিলুপ্ত করে ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়াকে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করে। সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হয় তখনকার ব্রিটিশ ভারতের অংশভুক্ত বার্মার রেঙ্গুনে। সম্রাটের ভাগ্যের কাহিনি বিবৃত করেন দেবেন্দ্রনাথ:

> বেলা দুই প্রহরের সময় কানপুরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ঘোড়া বদলাইবার জন্য আমার গাড়ি থামিল। দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তাম্বু পড়িয়াছে, লোকের বিস্তর ভিড়, এবং সেখানে একটা বাজার বসিয়াছে। কিছু খাদ্যের জন্য কিশোরীকে পাঠাইলাম; সে সেখান হতে আমার জন্য মহিশের দুগ্ধ আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কিসের বাজার? বলিল, 'দিল্লীর বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার।' সিমলাতে যাইবার সময়ে ইহাকে যমুনার চরে সুখে ঘুড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম। আজি আসিবার সময়ে ইহাকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দী হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? (২০০৮: ১৬৯)

মহাবিদ্রোহের যখন সূচনা হয় তিনি সিমলায়। শুরুর দিককার বর্ণনা পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথের রচনায়:

> ১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে সিমলাতে সংবাদ আইল যে, সিপাইদের বিদ্রোহে দিল্লী ও মিরাটে একটা ঘোরতর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠ্যতে কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল আন্সন দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোড়ায় চড়িয়া সিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। সিমলার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য ছিল, তিনি যাইবার সময় সেই গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, 'গুর্খা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিও।' গুর্খারা নির্দোষ, তাহাদিগের সহিত সিপাহিদের যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই। সাহেবরা জানেন যে, কালা সিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্খাদিগকে নিরস্ত্র করিবার হুকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্খাদিগকে বন্দুক রাখিতে হুকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, বন্দুক রাখিল না; পরন্তু তাহারা ইংরাজ অফিসারদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠতে সিমলা আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল। (২০০৮: ১৪৬)

সিমলা থেকে ফেরার পথে পথে মহাবিদ্রোহের আঁচ পান তিনি। সিমলা থেকে কালকা, পঞ্জৌর, আম্বালা, কানপুর, এলাহাবাদ। কানপুর থেকে ট্রেনে এবং এলাহাবাদ থেকে স্টিমারে কলকাতা অবধি সর্বত্র উত্তেজনা আর আতঙ্ক। আম্বালা থেকে ফেরার পথের বর্ণনা এমন:

> অম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ি ভাড়া করিলাম, এবং তাহাতে চড়িয়া দিনরাত্রি চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ি হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ির পাশে পাশে ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গবর্নমেণ্ট পথিকদিগের নিরাপত্তার জন্য গাড়ির সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছুটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার মনে মনে কিছু শঙ্কা হইল। (২০০৮: ১৬৯)

আমরা প্রতিনিয়ত যে ইতিহাস অনুসন্ধান করে বেড়াই তা মূলত মানবসভ্যতার উত্তরণে ফেলে আসা দিনের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরির প্রয়োজনে। অতীতজ্ঞান বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে। ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির রসদ জোগায়। পেছনের কথা জানার জন্য ইতিহাসতত্ত্বে বহু মত ও পথের কথা আমরা জানি। মনীষীর জীবনী তাতে অতি দরকারি একটা পথ। জীবনী একজনেরটা অন্যজন লেখেন। তাতে লেখকের মত-অভিরুচি ও মতবাদের কারণে সত্যের নানা রকম প্রমাদ ঘটার ঝুঁকি থাকে। মনীষী ও তাঁর সমকালকে জানার জন্য *আত্মজীবনী* দারুণ সহায়ক উপকরণ। নিজের জীবনের কথা নিজের চেয়ে ভালো আর কে বলতে পারে! উনিশ শতকের বাংলাকে জানার জন্য যেসব আত্মজীবনীর ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি, তাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* এক মহৎ উৎস। শুরুতেই যেমনটা বলা হয়েছে, এই বই যতটা না ইতিহাস বা তাঁর নিজের জীবনের গল্প, তার চেয়ে বেশি তাঁর ঈশ্বর-অনুধ্যানের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান। সেসব তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে তত্ত্ববিশ্বের আয়োজন সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতেই উনিশ শতকের নবজীবনলাভের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্‌যোগ-পর্বের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস, সেই বাড়ির মানুষদের জীবনপথের খুঁটিনাটি বাংলার ইতিহাসকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* সেই রূপান্তর পর্বের এক ঐতিহাসিক দলিল।

সহায়কপঞ্জি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৮)। *আত্মজীবনী* (আবদুশ শাকুর সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)। 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী সম্পর্কে', *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৮)। *ছেলেবেলা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৮৩)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩)। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: আধুনিক যুগ* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

স্বপন বসু (১৯৮৫)। *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি